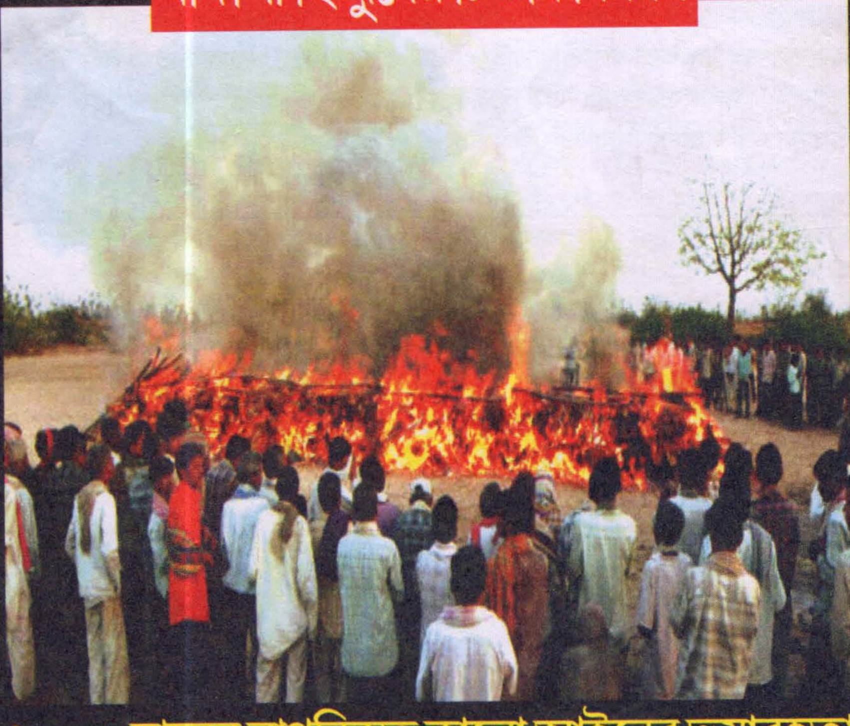
জ্বলন্ত চিতা

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের বলি
বাঙ্গালী হিন্দুদের চিতার বিবরন



২০০৩ সালের নাগরিকত্ব কালো আইনের ভয়াবহতা

মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্য

প্রকাশকের কথা

জাত-পাতের নিঃষ্ঠুর জাতা কলে নিস্পেষিত হিন্দু সমাজ। বর্ণ বিদ্বেষ আজ সারা পৃথিবীর কলঙ্কিত লজ্জাজনক অধ্যায়। ভারতবর্ষ তার ব্যাতিক্রমী নয়। ভারতে জাত-পাতকে পাথেয় করে এক শ্রেনীর মানুষেরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে উঠে গিয়েছে। এই জাত-পাতের সুত্রকে কাজে লাগিয়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছে বাঙ্গালী সমাজকে। তাই ভারতে বাঙ্গালীরা আজ চির দুর্বল। বাঙ্গালীর প্রধান জনশক্তি নমঃশূদ্র সমাজ ও পুর্ববঙ্গ থেকে আগত বর্ণহিন্দুরা যাতে ভারতে মাথা তুলে দাড়াতে না পারে তার পাকাপাকি ব্যাবস্থা করা হয়েছে ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে বাংলার নমঃশূদ্র সমাজ। এই মুহুর্তে বাঙ্গালী বর্ণহিন্দু ও নমঃশূদ্র সমাজের লোকদের জানা দরকার, কি কৌশলে বাঙ্গালী বর্ণহিন্দু ও নমঃশূদ্রদের চিরকাল ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছে। তাই আজ এই জ্বলন্ত চিতা পুস্তকটি প্রকাশিত হলো। এই পুস্তকটি যদি বাঙ্গালী জাগরণের সহায়ক হয় তাহলে শূদ্র সমাচার পাবলিকেশন্স নিজেদের ধন্য মনে করবে।

অনুপ কুমার মন্ডল

প্রথম সংস্করন ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩

প্রকাশক ঃ
শূদ্র সমাচার পাবলিকেশন্সের পক্ষে
অনুপ কুমার মন্ডল
বি-৭৮ স্যাটেলাইট টাউন, শিলিগুড়ি
Ph : 9832423947

সম্পাদনায়ঃ
চিন্ময় চক্রবর্তী

প্রাপ্তিস্থানঃ
শূদ্র সমাচার পাবলিকেশন্স
বি-৭৮ স্যাটেলাইট টাউন,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০১৫
ফোনঃ ৯৪৩৪১৭৬৭৮৪

বিনিময় ঃ ১০ টাকা +

বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের ক্ষমতালিপ্সুদের নিকটে একটি বড় আতঙ্কের কারন হয়ে দাড়িয়েছে সেই বৃটিশ শাসনকাল থেকেই। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্ব, যতটা না আতঙ্কিত করেছিল বৃটিশ শাসকদের, তার থেকেও অনেকগুন বেশী আতঙ্কিত করেছিল হিন্দিভাষী কংগ্রেস নেতাদের। গান্ধিজীর বিরোধীতা সত্বেও নেতাজী কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসে, হিন্দি বলয়কে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে বাঙ্গলীরাও শেষ কথা বলার ক্ষমতা রাখে। আর তখন থেকেই বাঙ্গালীরা হিন্দুস্থানী নেতাদের রোষানলে পড়ে যায়। পাশাপাশি বৃটিশ শাসকদের পিটিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনার মুল নায়ক ছিলেন বাঙ্গালী নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু, যার ফলে বাঙ্গালীরা বৃটিশদেরও রোষানলে পড়ে যায়। ফলে ইংরেজ ও হিন্দুস্থানী কতিপয় নেতাদের মিলিত শক্তি বাঙ্গালী নিধনে ব্রতী হয়। যার ফল স্বরূপ বাংলা ভাগ ও নেতাজীকে ভারতের বাইরে রাখার পরিকল্পনা রচিত হয়। বাঙ্গালী শক্তিকে দুর্বল করার সমস্ত প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

অপরদিকে বাঙ্গালীর প্রধান জনশক্তি নমঃশূদ্র সমাজ হিন্দুস্থানী নেতাদের কৃতকর্মের জবাব দেয়। জাতীয় কংগ্রেসের অনিচ্ছা থাকা সত্বেও ভারতের গণপরিষদের নির্বাচনে নমঃশূদ্ররা বাবা সাহেব আম্বেদকরকে নির্বাচিত করে। গণতন্ত্রে জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস, তা সে জনগন যে জাতেরই হোকনা কেন? ভোটার হলেই হলো। আর বাঙ্গালীর এত গণতান্ত্রিক ভোট শক্তির মুল হলো নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী। এতবড় জনগোষ্ঠী যদি বিরুদ্ধাচরন করে তার পরিনতি রাজনৈতিক দলের নিকট কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা একদিন বুঝেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা, যেদিন বাংলার নমঃশূদ্ররা কংগ্রেসের প্রবল বাধা সত্বেও নিম্ন জাতির প্রতিনিধি হিসাবে বাবা সাহেব আম্বেদকরকে ভোট দিয়ে ভারতের গণপরিষদে পাঠিয়েছিলেন।

বাঙ্গালী নেতা হয়ে জাতীয় কংগ্রেসে নেতাজীর সভাপতিত্ব গ্রহন ও নমঃশূদ্রদের দ্বারা বাবা সাহেবের গণপরিষদে নির্বাচন, এই দুই সুত্র ধরেই বাঙ্গালী ও নমঃশূদ্র সমাজ শাসকদের নিশানায় চলে এসেছে। তাই বাংলা ও নমঃশূদ্র সমাজকে খন্ড বিখন্ড করার চক্রান্তে রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পুর্ন বিপরীতমুখী হওয়া সত্বেও সকল ক্ষমতাধরেরা এককাট্টা হয়ে যায়। এ কথা আজ অস্বীকৃত সত্য যে, মারাঠি এবং হিন্দি বলয়ে সাধারন নির্বাচনে সরাসরি জনগনের ভোটে পরাজিত হওয়ার পরে নমঃশূদ্র সমাজের অবদান না থাকলে, বাবা সাহেব সারা বিশ্বে স্বাধীন ভারতবর্ষের একজন প্রানপুরুষ হিসাবে লড়াই করার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হতে পারতেন। শূদ্র সমাজের কোন মানুষ ক্ষমতার মালিকানা গ্রহন করুক সেটা তৎকালীন ও বর্তমান শাসনকর্তারা কে-ইবা চায়। ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে নিম্নকুলে জন্মে বাবা সাহেব হাজারো উতিকুলতা ডিঙ্গিয়ে নিজ ক্ষমতাবলে উঠে এসেছিলেন শিক্ষা পিরামিডের শীর্ষে। এটাই কাল হয়েছিলো তৎকালীন শাষকদের ধারাবাহিকতায়। চরম বাধা দান করেও থামাতে পারেনি তারা বাবা সাহেবের শিক্ষার রথ। সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য শাসকেরা শেষমেশ বাবা সাহেবকে রাজনৈতিক ভাবে ব্রাত্য রাখার কৌশল অবলম্বন করে জনগন থেকে বিছিন্ন করার চেষ্টা চালাতে শুরু করলেন। সফলও হয়েছিলো অনেকটা। গণ পরিষদের নির্বাচনে বাবা সাহেব হিন্দি বলয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। তৎকালীন কংগ্রেস পার্টির সভ্য হিসাবে গণ পরিষদের নির্বাচনে তিনি নমিনেশনটি পর্যন্ত পেলেন না। ঠিক এই একই ধারা অব্যাহত রয়েছে বর্তমান বেশীরভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকা গুলোতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্রে নমঃশূদ্রদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। ঘটনা পরম্পরা কিন্তু একই, নিম্নবর্নের লোক হিসাবে বাবা সাহেবের ন্যায় নমঃশূদ্র শিক্ষিত ব্যাক্তিদের রাজনৈতিকভাবে ব্রাত্য রাখার কৌশল। অথচ অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের পরিসংখ্যান বলছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন নমঃশূদ্র ব্যাক্তিরা রয়েছেন। কেন আজ নমঃশূদ্র (বিশেষ করে যারা রাজনীতি করছেন) শিক্ষিত ব্যাক্তিরা বাবা সাহেবের মতো রাজনৈতিক

নিশানায় রয়েছেন তার কারন অনুসন্ধানের সময় এসেছে। কোন দেশ ও সমাজকে জাগাতে হলে উচ্চ শিক্ষা, পান্ডিত্যের যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করতে জনশক্তি ও জনসমর্থন একান্ত জরুরী। বাঙ্গালী সমাজকে একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন তাদের মধ্যে নমঃশূদ্র জনজাতির সংখ্যা সবথেকে বেশী। তাই নমঃশূদ্রদের সামগ্রিক উন্নয়ন না ঘটিয়ে বাঙ্গালীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। সে যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন? শিক্ষা, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে হাতে গোনা কয়েকটা I.A.S./I.P.S. ডাক্তার, ইনজিনিয়ার পাওয়া যেতে পারে যেটা সমাজের নিকটে বড় প্রাপ্তি ও জরুরী। এগুলোর মাধ্যমে সীমিত প্রশাসনিক ক্ষমতা পাওয়া যায়, যা আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধারীদের আদেশের উপর দ্বায়বদ্ধ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভিন্ন উচ্চ শিক্ষাটা কতটুকু মর্যাদাহীন হতে পারে তার বড় প্রমান বাবা সাহেব আম্বেদকর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে এতবড় পন্ডিত ব্যাক্তিকেও প্রায় মুল্যহীন করে রাখতে চেয়েছিলো তৎকালীন উচ্চবর্ণীয় শাসকেরা। জন-জাগরন, গণবিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভিন্ন জাতির উন্নয়ন করা যাবে না একথা বুঝতে পেরেছিলেন শূদ্র সমাজের প্রানপুরুষ শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাই তিনি শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি বলেছিলেন ''যে জাতির রাজা নেই, সে জাতি তাজা নেই।,, আর এই সুত্রটিকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন মহাপ্রান যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল। তিনি কংগ্রেসের সকল ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে বাবা সাহেব আম্বেদকরকে শূদ্রের রাজা হিসাবে গণ পরিষদে পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে যতটুকু জানা যায় তৎকালীন উচ্চবর্ণীয় রাজনীতিকরা বাবা সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের ইতিটা প্রায় টেনেই দিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক ক্ষমতার বাইরে রেখে রাষ্ট্রের নিকটে বাবা সাহেবকে অপ্রাসঙ্গিক রাখাটা প্রায় চুড়ান্তই ছিলো। তাই গণ-পরিষদে যাওয়ার রাস্তাটা বাবা সাহেবের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলো জাতীয় কংগ্রেসের চালকেরা। শূদ্র সমাজের এ হেন দুর্দিনে ত্রাতার ভুমিকায় এসেছিলো কিন্তু বাংলার নমঃশূদ্র সমাজের প্রতিনিধিরা। পৈত্রিক সম্পত্তির মালিকানার মতো ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করার মালিক জাতীয় কংগ্রেসের মুখের উপর জবাব দেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলো একমাত্র বাংলার নমঃশূদ্র সমাজ। জাতীয় কংগ্রেসের চরম হুমকি বিরোধীতাকে তোয়াক্কা না করে তৎকালীন পুর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র নায়ক যোগেন মন্ডল বাবা সাহেবের অপমানের যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন। হিন্দি বলয়ে শূদ্র সমাজকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে বাংলার নমঃশূদ্র লাঠি, যোগেন মন্ডলের নেতৃত্বে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিলো সমস্ত চক্রান্তকে। হিন্দি বলয় থেকে উড়িয়ে এনে বাংলার নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকা থেকে গণ-পরিষদে নির্বাচিত করা হয় বাবা সাহেব ভীম রাও আম্বেদকরকে। তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা উগরানো বমিকে ঢোক গেলার মতো গিলে খেতে বাধ্য হয়েছিলেন, বাংলার নমঃশূর্দ্র ব্যাক্তিদের প্রতিরোধের কারনে। বাবা সাহেব ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে গণ-পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলার নমঃশূদ্র সৈনিক যোগেন মন্ডল(বরিশাল), দ্বারিকা নাথ বারুরী(ফরিদপুর), গয়া নাথ বিশ্বাস(কুমিল্লা), ক্ষেত্র নাথ সিংহ(রংপুর) ও খুলনার মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের হাতে এহেন অপমান সহ্য করতে পারেনি দেশভাগের নেতৃত্বদানকারী উচ্চবর্ণীয় ব্যাক্তিরা। তাই ছলে বলে কলে কৌশলে কিভাবে নমঃশূদ্র সমাজকে ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে রাখা যায়, তার নীলনকশা তৈরীতে ব্যাস্ত হয়ে পড়েন ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দরা। যার বহিঃপ্রকাশ দেশভাগের সীমানা নির্ধারন, তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারনা নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকাগুলো যেখান থেকে বাবা সাহেবকে নির্বাচিত করা হয়, সেই (পুর্ববঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা) এলাকাটিকে শাস্তি স্বরূপ স্বাধীন ভারতের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। কুটনৈতিক কৌশলে নমঃশূদ্র প্রতিনিধিদের বিভ্রান্তির মধ্যে রেখে দ্বিজাতি তত্ত্বের সুত্রকে আড়াল করে নমঃশূদ্র এলাকাটিকে মুসলিম শাষিত পাকিস্থানের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। অথচ দ্বিজাতি তত্ত্বের পরিসংখ্যানে পুর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে কিন্তু হিন্দু ধর্মালম্বীদের

সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০%। দ্বিজাতি তত্ত্বে মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো পাকিস্থানে এবং হিন্দু প্রধান এলাকাগুলো হিন্দুস্থান নামক ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। তাহলে কোন সুত্রে পুর্ববঙ্গের হিন্দু প্রধান এলাকাগুলো পাকিস্থানে ঠেলে দেওয়া হলো তার উত্তর কিন্তু অনন্তকাল অধরাই থাকবে। পুর্ববঙ্গের ৬ টি জেলা পাকিস্থানের সঙ্গে থাকা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। অনেকে বলে থাকেন এটা ছিল যোগেন মন্ডলের ঐতিহাসিক ভুল। কিন্তু প্রতিটি ঘটনার পিছনে পর্দার অন্তরালে কিছু থেকে যায়। কিছু কিছু মহলের ধারনা এখানেও একটা বৃহৎ কুটনৈতিক চক্র কাজ করছিল। হয়তো পর্দার আড়ালে যোগেন মন্ডলকে বড় ধরনের কোন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তা না হলে স্বধীনতা লাভের পর পরই যোগেন মন্ডল পুর্ববঙ্গের ৬ টি জেলাকে নিয়ে আলাদা কিছু ভেবেছিলেন কেন? গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল নাতো? বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, শুধুমাত্র যোগেন মন্ডলের ঘাড়ের উপরে দোষ চাপিয়ে পুর্ববঙ্গের কোটি কোটি হিন্দুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দায় তৎকালীন শাষকেরা এড়িয়ে যেতে পারেন না। পাকিস্থান আশ্রিত জঙ্গি, যারা সব সময় হিন্দু নিধনে ব্রতী হয়, যাদের নাশকতার ভয়ে শক্তিধর ভারত নিজের নিরাপত্তায় হিমশিম খায়, সেই পাকিস্থানের হাতে কোন ভরসায় পুর্ববঙ্গের হিন্দুদের তুলে দেওয়া হলো তার সদুত্তর কি আদৌ দিতে পারবেন দেশভাগকারী হিন্দু নেতারা? ক্ষুধার্ত বাঘের মুখে এক টুকরো মাংস ফেলে দেওয়ার মতো নয় কি? কথিত রয়েছে দ্বিজাতি তত্ত্বের আবিস্কারক(বিতর্কিত তথ্য) পাকিস্থানের জনক মোহাম্মদ আলী খান জিন্নাহ্। যে রাষ্ট্র নায়কের প্রথম স্বরলিপি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতায় ভরা, তার দেশে হিন্দুরা কতটুকু নিরাপদ তার প্রমান দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু নিধনের দৃশ্যতেই স্পষ্ট। চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এই সব নিরীহ মানুষগুলোকে, যেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে। পাক হানাদারেরা যে ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত হরন করেছে তার বেশীর ভাগই ছিল হিন্দুধর্মালম্বী বাঙ্গালী ও নমঃশুদ্ররা। দেশভাগের উচ্চবর্ণীয় হিন্দু নায়কেরা ১৯৪৭ সালে দেশের সীমানা তৈরী করে নীরিহ কিছু হিন্দুদের রেডিমেড জ্বলন্ত চিতা সাজিয়ে দিয়েছে। যে চিতায় নতুন করে আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন নেই, এমনিতেই মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মোটকথা তৎকালীন শাষকেরা এটা পরিস্কার বুঝতে পেরেছিলেন, যদি এই নমঃশুদ্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতের মাটিতে থাকে তাহলে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮৫% নিম্নজাতি জনগোষ্ঠীর ঘুম ভাঙ্গাতে বাবা সাহেব সফল হবেন। নমঃশুদ্ররা হিমালয় পর্বতের মতো দাড়িয়ে থাকলে কোন শক্তিই বাবা সাহেবের গতিকে রোধ করতে পারবে না। তাই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারনা যেকোন কৌশলে বাংলার নমঃশুদ্রদের বিভাজন ঘটিয়ে বাবা সাহেবের শুদ্র আন্দোলনকে চিরতরে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার পাকা পোক্ত ব্যবস্থা করা হলো দেশভাগের সীমানা নির্ধারনের মাধ্যমে। এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাবা সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে শূদ্র আন্দোলন করার শাস্তি দেওয়া হলো, বাংলার নমঃশূদ্রদের।

পাশাপাশি নেতাজী সুভাষ বোস গান্ধীজির অনিচ্ছা সত্ত্বেও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা হওয়ার শাস্তি পেলেন বাঙ্গালীরা। দেশভাগের নামে খন্ড খন্ড করে দেওয়া হলো বাংলা ও নমঃশূদ্র সমাজকে, যেন কোন অবস্থাতেই বাঙ্গালীরা জনসংখ্যাধিক্যের বলে বলিয়ান হয়ে হিন্দি বলয়ের নেতাদেরকে চোখ রাঙ্গাতে না পারে। ধারনা করা হচ্ছে অত্যন্ত সুকৌশলে বাংলাকে ভাগ করে, জাতীয় কংগ্রেস নয়, ভবিষ্যতে উগ্র মুসলিমদের সঙ্গে লড়াইয়ের রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হলো বাঙ্গালী নমঃশূদ্রদের। কোন অবস্থাতেই একটা বিষয় কেউ প্রশ্ন করছেন না, হিন্দুস্থান ও হিন্দু জাতির জন্য বাঙ্গালী ও নমঃশূদ্ররা কেন বারবার বলিদান হবেন?

বলিদান ১।

কথিত রয়েছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসকে যেদিনই পাওয়া যাবে, সেই দিনই বৃটিশদের হাতে তুলে দিতে হবে। ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ার পিছনে এটা বৃটিশদের দেওয়া একটা বড় শর্ত।

তাই যদি হয় তাহলে এ কথা বলা নিঃশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে, নেতাজীর শরীরের বিনিময়ে ভারত স্বাধীন হলো। অর্থাৎ ভারতের সকলেই স্বাধীন হলেন, কিন্তু বলি হলেন শুধুমাত্র বাংলার সন্তান।

বলিদান ২।

ভারতের মধ্যে বহু অবাঙ্গালী এলাকা রয়েছে যেখানে ৯০% মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস অথচ সেই সমস্ত এলাকা বাদ দিয়ে সামান্য সংখ্যক বাঙ্গালী মুসলিমদের ভারতের বাইরে রাখার জন্য পুর্ব পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করা হলো। পশ্চিম পাকিস্থানের থেকে পুর্ব পাকিস্থানে জনসংখ্যা বেশী থাকলে, ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে পশ্চিম পাকিস্থানের মুসলিমদের দমিয়ে রাখা যাবে, এই সুত্রে পুর্ব ভারতের বাঙ্গালী হিন্দু যেখানে বেশীর ভাগই নমঃশূদ্র, সেই সমস্ত এলাকাগুলোকে পাকিস্থানের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলো। হিন্দুস্থানের নিরাপত্তার স্বার্থে এখানেও বলি দেওয়া হলো বাঙ্গালী নমঃশূদ্রদের।

বলিদান ৩।

পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে পুর্ব পাকিস্থানকে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আলাদা করার পরিকল্পনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্থানের সেনাবাহিনী পুর্ববঙ্গে শুধুমাত্র হিন্দুদেরই বেছে বেছে হত্যা ও ধর্ষন করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ যা ছিলো নিতান্তই হিন্দুস্থান ও ভারতে বসবাসকারী হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য, সেখানেও পুর্ব বাংলায় বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ বাঙ্গলী হিন্দু (যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই নমঃশূদ্র) বলি হলেন।

বলিদান ৪।

১৯৫৫ সালের নাগরিক আইন ৫/১/ক ও গ ধারায় যেখানে একনাগাড়ে ৬ মাস অবধি বসবাসকারী লোকেরা ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই আইন থাকা সত্বেও ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অত্যাচারিত নির্যাতিত বাঙ্গালী হিন্দুরা যাহাতে ভারতের নাগরিকত্ব না পায়, তাহার জন্য ভারত সরকার ১৯৭১ সালে ২৯ শে নভেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। কারন পুর্ববঙ্গের হিন্দুরা পাকিস্থানীদের অত্যচারে যত বেশী চেচাবে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারত ততবেশী দরবার করতে পারবে। বিশ্বের দরবারে কুটনেতিক জয়ে এখানেও কিন্তু সেই বাঙ্গালী বর্ণহিন্দু ও নমঃশূদ্ররা বলি হলেন।

বলিদান ৫।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত পন্থী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব নেয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কংগ্রেসের ইন্দিরা গান্ধী। কারন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকলে ভারতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকবে। তাই নির্যাতিত হিন্দুদের (যার মধ্যে ৯০% নমঃশূদ্র) আবার পুর্ববঙ্গে সেই একই বিপদের মুখে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হলো, ভারত বন্ধু শেখ মুজিবরের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য। ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে এখানেও কিন্তু বাঙ্গালী নমঃশূদ্রদের বলি দেওয়া হলো।

আরো অনেক ঘটনা রয়েছে যা থেকে পরিস্কার উপলব্ধি করা যায়, কোন একটা অদৃশ্য পরিকল্পনায় বাঙ্গালী ও বাংলার নমঃশূদ্র সমাজ পশ্চিম শাষকদের নিকটে চিরদিনই শত্রু হিসাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ ভারতকে স্বাধীন করতে বৃটিশ সেনাদের হাতে বাঙ্গালী ও নমঃশূদ্র সমাজকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ছিলেন বাঙ্গালীর সন্তান, তাই বাঙ্গালীদের প্রতি বৃটিশ সেনাদের অত্যাচারের মাত্রাটা ছিল অনেক বেশী। গ্রাম গঞ্জের অত্যাচারিত বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল নমঃশূদ্র জনজাতির। শিক্ষা কম থাকায় তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় তেমন একটা জায়গা পায়নি। যুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ অবধি শক্তিশালী ভারত গঠনে বাঙ্গালী ও নমঃশূদ্র সমাজের ভুমিকা অপরিসীম। নমঃশূদ্রদের নামে সন্ত্রাসবাদী অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা কোন ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। দেশাত্ববোধের এহেন একটি জনগোষ্ঠীর কথা না ভেবে বাংলা

তথা ভারতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। একথা আজ প্রমান হয়ে গিয়েছে, যে সমস্ত বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দরা বাংলাকে ভাগ ও নমঃশূদ্র সমাজকে দুর্বল করার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠার মেরেছেন। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালী শুধুমাত্র শরিকের ভূমিকাতে থাকে। কখনোই কিং মেকার হিসাবে নয়। অবিভক্ত বাংলায় বাঙ্গালী ভোটারের সংখ্যাধিক্যের জোয়ারের মধ্যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের পরে বিভক্ত বাংলায় ভারতের নেতৃত্বের শীর্ষে আর কাউকে তেমন পাওয়া যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের বলে বলিয়ান হয়ে ভিন রাজ্যের তিন ভোটের মালিকেরা রাজধানী দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিগত দুই দশকের ইতিহাসে বাঙ্গালীদের মাথার উপর কাঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। বাম জমানায় লোকসভায় বামবিজিত আসনের মধ্যে ৭০% আসনই ছিলো বাঙ্গালীদের ভোটে বিজয়ী আসন। অথচ সেই বামফ্রন্ট বিশেষ করে সি,পি,এমের সর্বময় ক্ষমতা থাকতো অবাঙ্গালীদের হাতে। ভারতের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীত্ব হাতে পেয়েও বাংলা বঞ্চিত হলো, অবাঙ্গালীদের বিরোধীতার জন্য। এটা ঠিক যে, যদি সি পি এমের একক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হতো তাহলে কোন অবস্থাতেই জ্যোতি বসুর নাম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হতো না। সেখানে কোন না কোন অবাঙ্গালীর নামই উঠে আসতো কারন পার্টির পলিটব্যুরোতে বাঙ্গালীদের ক্ষমতা ছিলো সাক্ষী গোপালের মতো। যুক্তফ্রন্টে যখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতিবাবুর নাম উঠে আসে তখন বাংলার কোন কমরেড তার বিরোধীতা করেছিলো বলে মনে হয়নি। বাংলার ভোটে বলিয়ান সি পি এম, অথচ সেই বাংলার আবেগকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলো তিন ভোটের মালিক অবাঙ্গালী কয়েকজন কমরেডরা। শুধু এখানেই শেষ নয়, যে সমস্ত অবাঙ্গালী কমরেডরা নিজেদের হিন্দী বলয়ে জীবনে কোনদিন সরাসরি জনগনের ভোটে সাংসদ হতে পারেননি--- তারাও বাংলার বিধানসভা থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে দিল্লী দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গো-হারা হেরে প্রাপ্ত এম,এল,এ, -দের নিয়ে রাজ্যসভার একটি মাত্র আসন পেয়েছিল বামফ্রন্ট। সবেধন নীলমনির একটি মাত্র রাজ্যসভার আসন, সেটাও বাঙ্গালীদের কপালে জুটলো না, নিয়ে গেল সীতারাম ইয়েচুরিরা। ''হায় বাঙ্গালী কি দুর্দশা তোমার,,! অথচ কেরলে দীর্ঘদিন সি,পি,এম, ক্ষমতায় ছিল, সেখান থেকে কিন্তু রাজ্যসভায় একজনও বাঙ্গালী সদস্য মনোনয়ন পাননি। পশ্চিমবঙ্গে সিডিউল কাষ্টের তালিকায় সাব কাষ্ট হিসাবে বিবেচিত রয়েছে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নাম। নমঃশূদ্রদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষি। বামফ্রন্টের নেতাদের ভাষায় আম আদমী খেটে খাওয়া কৃষক শ্রমিকের দল হলো সি পি আই এম সহ অন্যান্য শরিক দল গুলো। যেহেতু সি পি আই এম বামফ্রন্টের মুল চালিকা শক্তি, তাই সেই সি পি আই এম দলে আম আদমি কৃষক শ্রমিকের মূল্যায়ন কতটা, তা একবার অনুসন্ধান করে দেখা যাক। কৃষক শ্রমিকের দল সি পি এম যাদের মুল ভোট ব্যাংক ছিলো কিন্তু বাংলার গ্রাম গঞ্জের মানুষ। আর বাংলার গ্রাম গঞ্জের বেশীর ভাগ এলাকায় কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটার হলো নমঃশূদ্র। বিগত ইতিহাসে লোকসভা তথা বিধানসভার সি পিএমের নির্বাচিত এম পি, এম এল এ-দের পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে তাদের মধ্যে কৃষি প্রধান নমঃশূদ্র এমপি ও এম এল এ দের সংখ্যা কটা ছিলো। গ্রাম গঞ্জে নমঃশূদ্রদের সঙ্গে কথা বল্লেই অনুধাবন কারা যায় তাদের হৃদয়ের মধ্যে পুঞ্জিভুত ক্ষোভের পরিমান কতটুকু। জোনাল কমিটি, রাজ্য কমিটির নেতারা সংগঠনের মিটিং-এ নমঃশূদ্রদের শুধু নীচের তলা মজবুত করার উপদেশ দিতেন। বড় বড় নেতাদের (যাদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের সংখ্যা নেই বল্লেই চলে) মুখে শোনা যেত, সি পি এম সংগঠন নির্ভর দল, তাই নীচের তলা মজবুত থাকলে উপর তলা ঝরে পড়ার কোন সম্ভবনা নেই। উপর তলার ক্ষমতার অলিন্দে নীচের তলায় নোনা ধরে যেতে পারে, এটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন সি পি এমের ক্ষমতাভোগী নেতারা। প্রকৃত বাঙ্গালী এলাকায় মুল ভোটার নমঃশূদ্র অথচ তাদেরকে বুথ কমিটি, লোকাল কমিটির উপরে কোন জায়গা

দেওয়া হতো না। যদিও দেওয়া হতো বড় জোর সদস্য পদ। ৮০% নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকা গুলোতেও পঞ্চায়েতের দায়িত্বে রয়েছেন অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা। ক্ষমতার আড়ালে সকলেই কিন্তু নিজের নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতিতে সাহায্য করেছেন। ক্ষমতার বাইরে থাকাতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। তাই নীচের তলায় গভীর ক্ষোভ জমে গিয়েছিল যার বহিঃপ্রকাশ ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ভোট বাক্সে। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলো। বামফ্রন্টের অতি বড় নিন্দুকেরাও কল্পনা করতে পারেনি লোকসভা ভোটে এতবড় বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। মমতা ব্যানার্জির পরিবর্তনের ডাকটি ছিলো নীচের তলায় জমে যাওয়া ক্ষোভের আবেগের ডাক। তাই মানুষ ২০১১ সালের বিধানসভাতেও ভোটের বাক্সে জবাব দিয়ে দিয়েছে। বামফ্রন্ট নিজেদের যতই অসাম্প্রদায়িক হিসাবে চিৎকার করুক না কেন, সাম্প্রদায়িক ভোটের প্রতি তাদের দুর্বলতা অথবা ভীতি রয়েছে প্রচণ্ড। যার প্রমাণ কমরেড হাজী রেজ্জাক মোল্লার ক্ষমতা প্রদর্শন। মুসলিম ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে মক্কা শরীফ থেকে হজ্ব করে আসার পরেও রেজ্জাক মোল্লার বিরুদ্ধে সি পি এমের পার্টি নেতৃত্ব টু-শব্দটি করতে সাহস পায়নি। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নাকি কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি বিরুদ্ধ কাজ। তারা পীঠে পুজো দেওয়ার পর প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তৎকালীন বামফ্রন্ট নেতারা প্রচণ্ড রেগে হম্বি তম্বি করেছিলেন। এমন কি দল থেকে বহিষ্কারের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। অথচ সেই সি পি এম রেজ্জাক মোল্লার হজ্ব যাত্রাটা প্রায় নিঃশব্দেই হজম করে নিলেন। গোটা সি পি এম তাদের নীতি আদর্শ প্রায় পরিবর্তনই করে দিলেন শুধুমাত্র মুসলিম ভোটে ধস নামার ভয়ে। পার্টির ভোট বিশ্লেষকেরা মুসলিম ভোটের বিশ্লেষণ করলেন, সাধারণতঃ যে ভোটগুলো নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলই টানাটানি করে। কিন্তু মূল ভোটে যারা সংখ্যাধিক্য সেই নমঃশূদ্র কমিউনিটির কোন বিশ্লেষণ তারা করেনি। তাই আজ তাদের পিছনে আম আদমি কৃষকদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

৩৪ বছরের বাম জমানার পরিবর্তনের পরে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে গঠিত হলো নতুন সরকার। গ্রাম শহরের আম আদমীর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেই নমঃশূদ্র প্রধান মতুয়া ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মমতা ব্যানার্জী নমঃশূদ্রদের মন জয় করে নিয়েছেন। নমঃশূদ্রদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি গ্রাম শহরের মানুষকে নিজের কাছেই টেনেছে। তাই বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার নমঃশূদ্ররা ভোট দিয়েছেন দুহাত ভরে। সরকারের শুরুতে রাস্তায় নিজহাতে ট্রাফিক কন্ট্রোল, মাঝে মধ্যে হাসপিটালে হঠাৎ অভিযান, এই সবকিছু আম আদমী দারুন ভাবে গ্রহন করেছে। বিরাট আশা আকাঙ্খা নিয়ে নমঃশূদ্র সমাজ মমতা ব্যানার্জীকে মতুয়া ধর্মের দীক্ষিতা গুরুবোন হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্শিতে বসতে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু সংখ্যালঘুদের তুলনায় নমঃশূদ্রদের উন্নয়ন দেখে বাংলার নমঃশূদ্র সমাজ হতাশ হয়ে পড়েছে। মতুয়া তীর্থস্থান ঠাকুরবাড়ীর উন্নয়নে হয়তো কিছু পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন যা চোখে পড়ার মতো নয়। কিন্তু একটা জনজাতি হিসাবে নমঃশূদ্ররা মমতা ব্যানার্জীর নিকট থেকে তেমন কিছুই পায়নি। সিডুল কাষ্ট সার্টিফিকেট পেতে নমঃশূদ্রদের হয়রানি বামজমানার তুলনায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। বছরের পর বছর অফিসে ঘোরাঘুরি করেও সিডুল কাষ্ট সার্টিফিকেট পায়নি এমন উদাহরণ রয়েছে ভুরিভুরি। নমঃশূদ্র নয় এমন ব্যক্তিদের নমঃশূদ্র পরিচয় দিয়ে সিডুলকাষ্ট সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সর্বত্র। এবং সেই সার্টিফিকেট বলে সিডুলকাষ্ট কোটায় চাকরিও করছেন অনেকে। ফলে প্রকৃত নমঃশূদ্ররা সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি কোন নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে একটু তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসতো সকল তথ্য। ছাত্রীদের সাইকেল, বৃত্তি, এককালীন ভাতা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছিটে ফোঁটাও নমঃশূদ্রদের ভাগ্যে জোটেনি। বরং উল্টো দলের মধ্যে নতুন নতুন লোকের আগমনের ফলে নমঃশূদ্রদের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। দিন যত এগোতে থাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কর্ম পরিধি ততবাড়তে থাকে। ফলে পর নির্ভরতা বেড়ে যায়। আর এই পরনির্ভরতার সুযোগে

দলে ভিড় জমাতে থাকে সুবিধাভোগী শ্রেনীর কিছু মানুষ। মমতা ব্যানার্জীর জনপ্রিয়তায় বাংলা থেকে বিরোধীরা যখন প্রায় নিঃচিহ্ন হওয়ার পথে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিগত বাম সরকারের সুবিধাভোগী কিছু লোক রাতারাতি দল বদলের নামে, লাল পোষাক পরিত্যাগ করে সবুজ পোষাক পরিধান করে নেয়। শুরু হয় আদি তৃনমুল ও নব্য তৃনমুলের লড়াই। সাংগঠনিক দক্ষতার কথা শুনিয়ে দলের মধ্যে বড় জায়গা করে নিতে, নব্য তৃনমুলীদের খুব একটা বেশী সময় নিতে হয়নি। আম আদমীর সামনে তৃনমুলের বেশ ধরে আবার চলে এল সেই বামফ্রন্টে থাকা নেতৃবৃন্দ, যাদের ভয়ে অথবা কর্মে বিতশ্রদ্ধ হয়ে বাংলার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছিলো। ফলটা দাড়ালো গ্রামে গঞ্জে যে সকল সাধারন নমঃশূদ্ররা মমতার জন্য লড়াই করেছে, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে, তারা যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেল। বরং অত্যাচারীরা ঘুরে ফিরে আবার ক্ষমতায় চলে এসেছে। নব্য তৃনমুলীরা যারা বামফ্রন্ট থেকে এসেছে তারা দল বদল করলেও মানসিকতার বদল করতে পেরেছেন কি ? আদি তৃনমুল ও নব্য তৃনমুলের স্নায়ুর লড়াইটা কিন্তু ছিলো নিস্প্রোয়জন। পশ্চিমবঙ্গে মমতার জনপ্রিয়তায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটি জায়গায় এসে দাড়িয়েছিলো যে, নব্য তৃনমুলীদের আর কোন রাস্তাই খোলা ছিলোনা। মমতা ব্যানার্জীর দলে এইসব আগন্তুকদের সাধারন সদস্য করে রাখলেও তাদের কিছু করার ছিলোনা। ৩৪ বছর চিৎকার চেচামেছি ও হাজারো অত্যাচার সহ্য করে সফল অসফল বহু আন্দোলনের মাধ্যমে মমতা ব্যানার্জী যাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন, তারাই আজকে আবার পোষক পরিবর্তন করে ক্ষমতার শীর্ষে চলে এসেছে। একথা বোধ হয় কেউ ভুলে যাননি যে, বামেদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে কলকাতায় তৃনমূল কংগ্রেসের ধারাবাহিক প্রতিবাদ মঞ্চে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয় রঞ্জন মুন্সীর সামনে কেঁদে কেঁদে মমতা ব্যানার্জী বলেছিলেন ''আমি আর এই বাংলায় থাকবো না, কারন ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না,,...... ঐ সময়ে মমতা ব্যানার্জীর মতো লড়াকু নেত্রীর যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে গ্রাম গঞ্জের সাধারন মানুষ যারা মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে ছিলেন তাদের অবস্থাটা কি ছিলো? হয়তো কলকাতার শীর্ষে আদি তৃনমুলীদের প্রাধান্য বজায় রয়েছে কিন্তু গ্রাম বাংলায় খোঁজ নিলেই জানা যাবে আদি তৃনমুলীদের ক্ষোভের কথা। বছরের পর বছর মমতা ব্যানার্জীর আন্দোলন ছিলো কিন্তু বামফ্রন্টের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। বিরোধীদলে থাকার সময় সরব হয়েছিলেন একাধিক দুর্নীতিকে সামনে রেখে। সি পি এমের নেতারা হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে, এ রকম কথাও শোনা গিয়েছিল বহু নেতা নেত্রীর মুখে। স্বাভাবিক ভাবেই সাধারন মানুষদের মনে প্রশ্ন জাগে কোথায় গেল সেই হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির তত্ব? ২০১৩ সালের শেষ অবধি পর্যন্ত একটা বাম নেতাকেও দুর্নীতির দায়ে জেলে পুরতে পারেনি মমতা ব্যানার্জীর মা-মাটি-মানুষের সরকার। দু একজন যা জেলে গিয়েছে তা আবার সম্পুর্ন অন্য ধরনের মামলায়। মার্ডার করে লাশ মাটিতে পুতে রাখা, যার কঙ্কাল মাটি খুড়ে বের করে অভিযুক্তকে মার্ডারের দায়ে গ্রেফতার করা, অবৈধ ভাবে মেডিকেল কলেজ চালানোসহ বিভিন্ন ধরনের মামলা, যার সঙ্গে সরকারে থাকাকালীন দুর্নীতির কোন সম্পর্ক নেই। ''বদলা নয় বদল চাই,, এটা ছিলো মমতা ব্যানার্জীর নির্বাচনী শ্লোগান। ৩৪ বছরের ক্ষোভকে শান্ত রাখতে এই শ্লোগানটি ছিলো সময় উপযোগী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ না নিলে গ্রামে গঞ্জে ৩৪ বছরের অত্যাচারের জবাবে রক্তের হলি খেলা হয়ে যেত। কিন্তু আইন সকলের জন্য সমান হওয়া উচিৎ। প্রতি ৫ বছর পর পর দক্ষিন ভারতের তামিলনাডুতে সরকার পরিবর্তন হয়ে যায় তথাপিও সেখানে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তরা আইনের হাত থেকে রেহাই পায়না। বিগত ৩৪ বছরের সরকারের কাজে দুর্নীতির দায়ে যদি কেউ অভিযুক্ত না হয়, তাহলে এটা কি ধরে নেওয়া হবে যে, বাম আমলে কোন দুর্নীতিই হয় নাই? তাই যদি হয় নির্বাচনের পুর্বে মমতা ব্যানার্জীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়াটা কি ছিলো মিথ্যা? আর যে হারে বাম নেতারা তৃনমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে তাতে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো এই সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। প্রথম সারির ব

নেতারা তৃনমূলে যোগদান না করলেও তাদের দোষররা কিন্তু দলে ভাল জায়গা করে নিতে সক্ষম হচ্ছেন। অতএব পুর্বতন পার্টনারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযান চালাতে গেলে দলের মধ্যেই এই সব দোষররা বিরোধীতা করবে। সুতরাং সাধারন দুর্নীতিহীন আম আদমির পক্ষে দলের বড় স্থানে জায়গা পাওয়াটা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে গেল। রাজনীতির মারপ্যাচে পড়ে গ্রাম বাংলার সেই খেটে খাওয়া আম আদমি কিন্তু চিরদিন শোষিতদের পক্ষেই রয়ে গেল। যদিও এখনো সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় রয়েছে প্রচুর। আম আদমির নিকটে চিরাচরিত নিয়ম মেনে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা থাকেনা। সময়ই বলে দেবে ক্ষমতার আসল উৎস কোথায় ? তবে আম আদমীদের সংখ্যা কমতে থাকলে দিল্লির মসনদ দখল করাটা মমতা ব্যানার্জীর নিকট দিবা স্বপ্নই রয়ে যাবে। কারন হিন্দি সাম্রজ্যবাদীদের মুখের উপর জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আর কোন বাঙ্গালীর এই মুহুর্তে নেই। তাই মমতাই ভরসা। মমতার জনপ্রিয়তাকে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা কোন মতেই ভাল চোখে মেনে নিতে পারছে না। মাঝে মাঝে দিল্লীর বিরুদ্ধে মমতার বিদ্রোহ হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের নেতাজী সুভাষ বোসের কথাটি মনে করিয়ে দেয়। তাই মমতার হাতকে দুর্বল করার লক্ষ্যে বাংলাকে আবার টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনায় ব্রতী হয়েছেন পশ্চিম ভারতের শাষকেরা। কখনো গোর্খাল্যান্ড, কখনো কামতাপুর রাজ্য আবার কখনো গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবীদারদের উৎসাহিত করা হয়। মোট কথা কোনমতেই বাংলার নেতাদের দিল্লীর মসনদের দিকে চোখ রাখতে দেওয়া হবে না। বাংলার অশান্তি মেটাতেই বাংলার নেতাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই যে কোন ইস্যুতে বাংলা অশান্ত থাকবে চিরদিন, যতদিন না বাঙ্গালীর জাতিস্বত্বার ঘুম ভাঙ্গবে। বাঙ্গালীর জাতিস্বত্বার ঘুম ভাঙ্গাতে হলে সর্বপ্রথম খাটি বাঙ্গালীর ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। আর এই খাটি বাঙ্গালী হচ্ছে নমঃশূদ্র সমাজ যারা সকলেই বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং বাংলাই তাদের মাতৃভাষা। গোর্খা, লেপচা, আদিবাসী, রাজবংশী যারা বাংলা ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকারই করে না তাদের জন্য বাঙ্গালীর সরকার বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষনা করছে অথচ এই খাটি বাঙ্গালী যারা কোনদিনও বাংলাকে ত্যাগ করবে না, সেই নমঃশূদ্রদের জন্য বাম ডান কোন সরকারই প্যাকেজ ঘোষনা করেনি। নমঃশূদ্ররাও যে সিডিউল কাষ্টের অন্তর্ভুক্ত এটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছে বাংলার সকল শাষকেরা। বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে অশান্ত উত্তরবঙ্গের সিডিউল কাষ্ট/সিডিউল ট্রাইভদের সরকারি চাকুরিতে বিশেষ সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কিছু অজানা কারনে সেই সুযোগ সুবিধা থেকে সিডিউল কাষ্টের আওতাভুক্ত হওয়া সত্বেও নমঃশূদ্ররা বঞ্চিত হচ্ছেন। পুলিশ প্রশাসনে নমঃশূদ্রদের সংখ্যা নেই বল্লেই চলে। সরকারি বিজ্ঞাপন অনুযায়ী পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে সিডিউল কাষ্টদের উচ্চতা ২ ইঞ্চি কম হলেও চাকরি হয়, কিন্তু সিডিউল কাষ্টের আওতাভুক্ত হওয়া সত্বেও ২ ইঞ্চি কম উচ্চতার নমঃশূদ্রদের বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। অশান্ত উত্তরবঙ্গের প্রশাসন থেকে নমঃশূদ্রদের নিঃচিহ্ন হয়ে যাওয়াটা হবে বাঙ্গালীর আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের সামিল। আর ঠিক এই কারনেই ১৯৯৫ **সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত** উত্তরবঙ্গে কে,এল,ও নামধারীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে দমাতে তৎকালীন বাম সরকারকে হিমসিম খেতে হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে কামতাপুর ভাষা ভিত্তিক আন্দোলনকে রাতারাতি বাংলাভাগের আন্দোলনে রূপান্তরিত করে দেওয়া হলো। চাওয়া হলো কামতাপুর রাজ্য এবং গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য। শুরু হয়ে গেল উত্তরবঙ্গে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর বিভেদ। ভুমিপুত্র নামধারী একদল উগ্র রাজবংশী (রাজবংশীরা সকলেই নয়) মানুষের রোষানলে পড়ল উত্তরবঙ্গে গ্রামে গঞ্জে থাকা সাধারন বাঙ্গালীরা। যাদের মধ্যে অধিকাংশই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক। একের পর এক দখল করে নেওয়া হলো চাষের জমি, ভিটে-মাটিসহ প্রচুর সম্পত্তি। বাংলার অখন্ডতা রক্ষায় আবার নমঃশূদ্র সমাজকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে। ভাটিয়া উপাধি দিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বাঙ্গালী বিতাড়নের পরিকল্পনায় ব্রতী হয় কিছু সংখ্যক কামতাপুর সংগঠন। মাঠে ময়দানে প্রকাশ্য জনসভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভুমিপুত্র নামধারনের

মাধ্যমে বাঙ্গালীদের জমি জমা দখলের হুমকি দেয়। নমঃশূদ্রদের বহু রেজিষ্টারী খতিয়ানভুক্ত জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। দিনে দুপুরে জমির মধ্যে ঝান্ডা তুলে দিয়ে জবর দখল করে নেওয়ার উদাহরণ রয়েছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে খাটি বাঙ্গালীদের আধিপত্য খুব একটা নেই বল্লেই চলে, ফলে প্রশাসনে প্রভাব খটিয়ে নমঃশূদ্রদের রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গে ৫৪ জন এম এল এ সদস্যদের মধ্যে একজন নমঃশূদ্র ব্যাক্তিরও জায়গা হয়নি অথচ প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই যোগ্য নমঃশূদ্র ব্যাক্তিদের অভাব নেই। ৩৩ টি সিডিউল কাষ্ট রিজার্ভ সিটেও নমঃশূদ্রদের জায়গা হয়নি। নামী দামী রাজনৈতিক দল গুলি নির্বাচনে কেশ নমঃশূদ্রদের নমিনেশনটি পর্যন্ত দেননি। সরকারি কাজে রাজনৈতিক যতগুলো নিয়োগ হয়েছে কোথাও নমঃশূদ্রদের স্থান দেওয়া হয়নি। এমনকি অঙ্গন ওয়াড়ি শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র নমঃশূদ্রদের বঞ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষা, চাকরি ও সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে নমঃশূদ্রদের সরিয়ে রেখে বাঙ্গালীদের শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গেও তৈরী হচ্ছে নমঃশূদ্রদের জন্য ভবিষ্যতের চিতা।

বৃটিশরা ভারতকে ২০০ বছর শাসন করতে পেরেছিলো শুধুমাত্র ইংরেজ দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন দিয়ে। মুক্তিকামী ভারতীয়রা সরকারি চাকরি করলেও ইংরেজদের সহজে মেনে নেয়নি। ভারতীয়রা প্রশাসনে থেকেই নিজেদের স্বার্থে লড়াই করে গিয়েছিলো। বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে দার্জিলিং-এ গোর্খাদের সরকারি চাকরিসহ বহু ধরনের প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। অথচ যখন বাংলা ভাগের আন্দোলন হয় তখন সেই সরকারি সাহায্য প্রাপ্তরাই আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকে। বাংলার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অর্থনৈতিক শক্তি জোগাতে থাকে সরকারি প্যাকেজ পাওয়া বেশীর ভাগ মানুষ গুলো। পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়ন হোক এটা সকলেই চায় তবে সেটা হওয়া উচিৎ সকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য। আর বাংলার স্বার্থে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্রদের উন্নয়ন একান্ত জরুরী কারন বাংলার অখন্ডতা রক্ষায় নমঃশূদ্ররাই গ্রামে গঞ্জে লড়াই করে থাকে। উচ্চ শ্রেনীর বাঙ্গালী যারা শাসক হিসাবে বাংলার মসনদ দখল করে রয়েছেন তাদেরও আজ বাংলা ভাবাবেগকে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে। বাঙ্গালীদের খন্ড খন্ড ভাগে বিভক্ত করার ফলে উচ্চ শ্রেনীর বাঙ্গালী যারা দিল্লির মসনদ দখল করতে পারতো, তাদের গতিকেও রোধ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে পুর্ব বাংলা থেকে আগত নমঃশূদ্রদের পুনর্বাসনের নামে, হিন্দি বলয়ে অবসবাসযোগ্য জমিতে বাসস্থান দিয়ে বাঙ্গালীদের টুকরো করা হয়. সেই সময় উচ্চ শ্রেনীর বাঙ্গালী শাসকদের প্রতিবাদ না করার ফল ভুগতে হচ্ছে সকল বাঙ্গালীদের। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল বাঙ্গালী যদি এক জায়গায় থাকতো তাহলে জনসংখ্যাধিক্যে ভোটবলে বলিয়ান হয়ে নেতাজীর মতো কেউ হয়তো আবার ভারতের ক্ষমতার শীর্ষে যেতে পারতো। উচ্চ শ্রেনীর শাসকদের বর্ণহিংসা বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিয়েছে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা হিন্দি বলয়ে পুনর্বাসন হচ্ছে তাই উচ্চ বর্ণীয় শাসকেরা কোন প্রতিবাদ করেননি। অথচ একটু প্রতিবাদ করলেই সমস্ত বাঙ্গালীদের বাংলার মধ্যে রাখা অসম্ভব ছিলোনা। সুতরাং নিম্ন শ্রেনীর যে সমস্ত লোকগুলো বর্তমানে শিক্ষিত হয়েছেন, নিজেদের ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছেন, উচ্চ বর্ণের লোকদের প্রতি তাদের ক্ষোভ থাকাটা স্বাভাবিক। কারন হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নমঃশূদ্র সমাজকে টুকরো করার ষড়যন্ত্রে কিছু উচ্চ বর্ণের লোকেরাও জড়িত ছিল। নিম্ন বর্নের লোকেদের স্থান যদি অনুন্নত, জঙ্গল এলাকায় শোভা পায়, সেটাতো বাংলার মধ্যেও হতে পারতো। বাংলার ভিতরেও ননিতাল, দন্ডকারন্যের মতো দুর্গম জায়গা রয়েছে। সেখানেও যদি বাঙ্গালীদের পুনর্বাসন দেওয়া হতো তাহলে উচ্চ বর্নের শাসকেরা আর কিছু না পেলেও কমপক্ষে একটা ভোটতো পেতে পারতেন। বাঙ্গালীদের ১০/২০ টা এম পি/এম এল এ বেশী হতে পারতো। বাঙ্গালী ও নমঃশূদ্রদের জলন্ত চিতা তৈরীতে বাংলার উচ্চ শ্রেনীর শাসকদের ভুমিকাও কম ছিলোনা। যার ফল ভুগতে হচ্ছে বর্তমান রাজনৈতিক

ব্যাক্তিত্বদের, যারা দিল্লির নাট্যে অল্প কিছু এম পি নিয়ে কেবল শরিকের ভূমিকাতেই রোল করে বেড়াচ্ছেন। বাংলার তৎকালীন শাসকেরা হিন্দি সম্রাজ্যবাদীদের সুক্ষ পরিকল্পনা ধরতে ব্যার্থ হয়েছেন। পুনর্বাসনের নামে বাঙ্গালীর বিভাজন ঘটিয়ে বাংলার নেতাদের শক্তির ক্ষয় ঘটাতে অবাঙ্গালী নেতারা সক্ষম হয়েছেন। পুর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্থান থেকেই কিন্তু দলে দলে হিন্দুরা ভারতে প্রবেশ করেছে। পুর্ব পাকিস্থানের বাঙ্গালী হিন্দুদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে হিন্দি ভাষীদের নিয়ন্ত্রিত জায়গায় যেখানে বাংলাভাষায় কেউ কথা বলেনা। অথচ পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আগত হিন্দুরা যারা প্রায় হিন্দি ভাষা বলতে ও বুঝতে পারেন তাদের একজন হিন্দুকেও পুর্ববঙ্গের দুর্গম জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি।

উচ্চ শ্রেনীর লোকদের এটা ভাবতে হবে যে বর্তমান গণতান্ত্রিক তৃতীয় বিশ্বে শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা যায়না। বর্তমানে শাসন ব্যাবস্থা নির্ভর করে পুরোপুরি জনসমর্থনের উপর। তাই নীচের লোকদের উপরে তোলার দ্বায়িত্ব নিতে হবে উপরে বসা লোকদেরই। একটা পাথরকে উপর থেকে টেনে তোলা সহজ কিন্তু নীচের থেকে ঠেলে উপরে তুলতে গেলে বিরাট শক্তির প্রয়োজন। কোন ট্রেনের বগিকে দুর্গম পাহাড়ে তুলতে হলে দুটি ইঞ্জিনের দরকার একটা উপর দিক থেকে টানে অন্যটি নীচের দিক থেকে ঠেলে। সুতরাং বাঙ্গালীদের অধিকার ফিরে পেতে হলে উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেনীকে হিংসা ত্যাগ করতে হবে। নিম্ন শ্রেনীর লোকদের যেমন প্রতিশোধের হিংসা ত্যাগ করতে হবে তেমনি উচ্চ শ্রেনীর লোকদের ভেদাভেদ ভুলে সাধারন মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তবেই বাংলা ফিরে পাবে তাদের ঋত গৌরব।

বাংলার ঋত গৌরব ফিরে পেতে হলে সকল বাঙ্গালীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। রক্ষা করতে হবে প্রতিটি বাঙ্গালীকে। বাঙ্গালী হয়েও একজন বাঙ্গালীকে রক্ষা করতে ক্ষমতাসীন বাঙ্গালী নেতারা ব্যর্থ হয়েছেন। ২০০৩ সালে ভারতের জাতীয় সংসদে সকল বাঙ্গালী এম,পি,রা বাঙ্গালী হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। পুর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙ্গালী নমঃশূদ্ররা যখন সকল ধকল সামলে নিজেদেরকে প্রায় গুছিয়ে নিয়ে বাঙ্গালী ও বাংলার শক্তি বৃদ্ধি করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় আবার দিল্লির হিন্দী সম্রাজ্যবাদীরা বাঙ্গালীদের দুর্বল করার খেলায় নেমে পড়ে। প্রতিটি নির্বাচনে ৮৫% বাঙ্গালীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, ফলে শতাংশের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সকল রাজ্যকে পিছনে ফেলে দেয়। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৫/১/ ক ও গ ধারা মোতাবেক পুর্ববঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দুরা ভারতে ৬ মাসের বেশী বসবাস করে নাগরিকত্ব গ্রহন করতে সামর্থ হয়। বাঙ্গালী ভোটার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভোটার সংখ্যার বিচারে বাংলার এম,পি,/এম,এল,এ -দের সংখ্যা বাড়াতেই হবে। আর বাংলার এম, পি,/এম, এল, এ -দের সংখ্যা বাড়লেই দিল্লির কপালে চিন্তার ভাজ পড়ে যায়। কারন তারা ইতিহাসকে খুব বেশী মনে রাখে, নেতাজী বাঙ্গালীর সন্তান হিসাবে ভারতের রাজনীতির শীর্ষপদটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আর দিল্লির অনিচ্ছা থাকা স্বত্বেও বাংলার নমঃশূদ্ররা বাবা সাহেবকে গণপরিষদে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালীরা পারে, অবশ্যই পারে যেকোন দর্প চুর্ন করতে। যে ভয়ের কারনে বাংলাকে দু টুকরো করে দিয়ে নেতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, সেই ভয় আবার তাদের তাড়া করতে থাকে। তাই যেন তেন প্রকারে বাংলার শক্তিতে আবার আঘাত হানতে তৈরী হয় ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। যে বিলের বলে বাঙ্গালীদের ভোটের শতাংশের হ্রাস টানা যেতে পারে। কি রয়েছে এই ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে, একটু বিশ্লেষন করে দেখা যাক।

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2003

Section 2.

'(b) "illegal migrant" means a foreigner who has entered into India-

(i) Without a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf; or
(ii) with a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf but remains therein beyond the permitted period of time;

২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সেকশন ২ এর বি ধারাতে "illegal migrant" কথাটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাহাতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত বিদেশী নাগরিক বৈধ পাসপোর্ট অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র ছাড়া ভারতে প্রবেশ করেছেন তারা সকলেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী "illegal migrant" হিসাবে চিহ্নিত হবেন। আবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এদেশে ঢুকে সেটাকে আইন মোতাবেক বৈধভাবে বসবাসের শীল মোহর করাতে হবে। আইনের মধ্যে "illegal migrant" শব্দটি রেখে পূর্ব বাংলা থেকে আগত হিন্দুদের নাগরিকত্ব আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৫ সালে ভারতে সর্বপ্রথম নাগরিকত্ব আইন তৈরীর সময় বলা হয়েছিল যদি কোন নাগরিক ভারতে প্রবেশ করে এবং নাগাড়ে ৬ মাস অবধি বসবাস করে তাহলে সে ভারতের নাগরিকত্ব পেতে পারে। সেখানে কিন্তু "illegal migrant" শব্দটির প্রয়োগ ছিল না। ফলে দেশ ভাগের বলি হয়ে যে সমস্ত হিন্দুরা পূর্ব বঙ্গে ছিলেন তারা কিন্তু খুব সহজেই ভারতে বসবাস করতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহেরু-লিয়াকত স্বাক্ষরিত চুক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF INDIA AND PAKISTAN REGARDING SECURITY AND RIGHTS OF MINORITIES (NEHRU-LIAQUAT AGREEMENT)

New Delhi,
8 April 1950

A. The Governments of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure, to the minorities throughout its territory, complete equality of citizenship, irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship, subject to law and morality. Members of the minorities shall have equal opportunity with members of the majority community to participate in the public life of their country, to hold political or other office, and to serve in their country's civil and armed forces.

Both Governments declare these rights to be fundamental and undertake to enforce them effectively. The Prime Minister of India has drawn attention to the fact that these rights are guaranteed to all minorities in India by its Constitution. The Prime Minister of Pakistan has pointed out that similar provision exists in the Objectives Resolution adopted by the Constituent Assembly of Pakistan. It is the policy of both Governments that the enjoyment of these democratic rights shall be assured to all their nationals without distinction. Both Governments wish to emphasise that the allegiance and loyalty of the minorities is to the State of which they are citizens, and that it is to the Government of their own State that they should look for the redress of their grievances.

B. In respect of migrants from East Bengal, West Bengal, Assam and Tripura, where communal disturbances have recently occurred, it is agreed between the two Governments:

(i) That there shall be freedom of movement and protection in transit;

(ii) That there shall be freedom to remove as much of his moveable personal effects and household goods as migrant may wish to take with him. Moveable property shall include personal jewellery. The maximum cash allowed to each adult migrant will be Rs.150 and to each migrant child Rs.75;

এখানে বি/১ ধারাতে পরিস্কার উল্লেখ করা হয়েছে দুই দেশের নাগরিকদের নিজেদের পছন্দসই দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে সম্পুর্ন স্বাধীনতা থাকবে। এই চুক্তিটি হয়েছিল কিন্তু দুই দেশের মাইনোরিটিদের রক্ষার ক্ষেত্রে। দেশ ভাগের পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু লোকের প্রানহানি ঘটে। এই সাম্পদায়িক দাঙ্গা রোধ করতে হিন্দুদের হিন্দুস্থানে ও মুসলিমদের পাকিস্থানে স্থানান্তরিতের উদ্দেশ্যেই এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মোতাবেক যে সমস্ত হিন্দুরা পশ্চিম ও পুর্ব পাকিস্থান থেকে এই দেশে আসবে তাদের বৈধতা দিতেই তৈরী হয় নাগরিকত্ব বিল ১৯৫৫। এই বিলে এক নাগাড়ে ৬ মাস ভারতে বসবাস করলেই নাগরিকত্ব পাওয়া যেত, তাই সহজেই পুর্ব বাংলা থেকে হিন্দুরা এদেশে বসবাসের সুযোগ পেতেন। কন্তু ২০০৩ সালে ভারতের জাতীয় সংসদে যে আইনটি পাশ করা হয় তাতে "illegal migrant" শব্দটির প্রয়োগ ঘটিয়ে পুর্ব বাংলা থেকে যে সমস্ত নাগরিক ভারতে এসেছেন তাদের নাগরিকত্বকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সহজ ভাষায় "illegal migrant" বলতে কি বোঝায় তা একবার ব্যাখা করলেই অনুমান হয়ে যাবে, এই আইনটি বাঙ্গালীদের ক্ষেত্রে কতবড় বিপদ জনক। "illegal migrant" ইংরেজী শব্দটির বাংলা অর্থ দাড়ায় অবৈধ অনুপ্রবেশ। এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আওতায় কারা কারা পড়তে পারেন ? ২০০৩ সালের আইন অনুযায়ী যারা ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালের পরে বিনা পাশপোর্টে অথবা সরকারের বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া এদেশে প্রবেশ করেছেন তারাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। পাশপোর্ট অথবা বৈধ অনুমতি পত্র বিষয়টি কি?

পাশপোর্ট

পাশপোর্ট হলো বিদেশে যাওয়ার সরকারি ছাড়পত্র। আইন অনুযায়ী পুর্ব পাকিস্থানের নাগরিকেরা ভারতের পাশপোর্ট পায় না। তৎকালীন পুর্ব পাকিস্থানের নাগরিকদের পাকিস্থানী পাশপোর্ট ব্যাবহার করতে হতো। পুর্ব পাকিস্থানী নাগরিকদের ভারতে আসার জন্য ঢাকায় অবস্থিত ভারত সরকারের অফিস থেকে ভিসা সংগ্রহ করে ভারতে ঢুকতে হতো। শুধুমাত্র ভারত ভ্রমনের জন্য টুরিষ্ট ভিসা ও স্থায়ী ভাবে ভারতে থাকার জন্য মাইগ্রেন্ট ভিসা সংগ্রহ করে পাশপোর্ট নিয়ে ভারতে প্রবেশ করা যেত। টুরিষ্ট ভিসা থাকলে তাকে অবশ্যই ভারত ছাড়তে হবে আর মাইগ্রেন্ট ভিসা থাকলে ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে পারবে। স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হলে সরকারি অফিসে নাম নথিভুক্ত করে প্রচুর কাগজপত্র জমা, সংগ্রহসহ দীর্ঘ ফর্মালিটিসের দরকার। যেগুলো পুর্ববঙ্গের বেশীরভাগ মানুষদের পক্ষে ছিল অসাধ্য। সেই কারনে পুর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেনীর লোকেরা (নমঃশূদ্ররা) ফাকা বর্ডারের সুযোগ নিয়ে পাশপোর্ট ছাড়াই সরাসরি ভারতে চলে এসেছে। আর যে কজন লোক মাইগ্রেন্ট ভিসায় কাগজপত্রের দীর্ঘ ফর্মালিটিস মেনে ভারতে এসেছেন তারা প্রায় সকলেই উচ্চ বর্নের মানুষ। কারন কাগজপত্রের ফর্মালিটিসের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন ছিল যা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পাওয়া যেতনা। সুতরাং ২০০৩ সালের আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব বজায় রাখার

ক্ষেত্রে পাশপোর্ট নিয়ে ভারতে প্রবেশকারীর সংখ্যা অতি নগন্য।

বৈধ অনুমতি পত্র বা মাইগ্রেশন (migration)

৮ এপ্রিল ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে চুক্তিপত্রের বি/ ১ ধারার বলে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে স্থানান্তরিতের কাজটা সহজ হয়ে যায়। ফলে প্রচুর সংখ্যক হিন্দুরা দল বেধে বেধে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। পাশপোর্ট ছাড়াই কেবলমাত্র ভারত সরকারের দেওয়া মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নিয়েই ভারতে প্রবেশ করা যেত। সেই সময় যারা যারা এই মাইগ্রেশন নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের একটি বৃহৎ অংশ ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনি আইনে বে-নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত হতে চলেছেন। কারন তৎকালীন সময় অধিকাংশ লোকই ভারতে প্রবেশের পরে মাইগ্রেশন রেজিষ্ট্রেশন করেননি। এবং ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভারত সরকারের নিকট থেকে সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট গ্রহন করেননি। যারফলে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

মোটকথা উপরে উল্লেখিত সকল শর্তাবলী পুরন করে যারা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন তাদের মধ্যে নমঃশূদ্র নাগরিক হিসাবে একজনকেও পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছেনা। কারন নমঃশূদ্র সমাজের প্রধান জীবিকা কৃষি। আর এই কৃষকদের পক্ষে আইনকানুন মেনে এত কাগজপত্রের ফর্মালিটি করা প্রায় অসম্ভব। বাংলা ভাষায় কথা বলার সুবাদে পুর্ববঙ্গের বাঙ্গালীরা অনায়াসে ভারতের নাগরিকদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে আর আত্মীয়তার সুযোগে ভারতে বসবাসের ব্যাবস্থাটাও সহজ। তাই বিনা পাশপোর্ট/কাগজপত্র ছাড়াই ওপার বাংলার মানুষেরা ভারতে প্রবেশ করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই আত্মীয়তার সুত্রে ভারতের নাগরিক হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে থাকে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পুর্ববঙ্গের বাঙ্গালীদের জন্য এটাই ছিল ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহনের রীতিনীতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে পুর্ববঙ্গের হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলাকলীন সময়, প্রানের ভয়ে যখন হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় গ্রহন করে, তখন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে ১৯৭১ সালে ২৯ শে নভেম্বর আন্ডার সেক্রেটারী সি, এল গোয়েলের স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশিকা জারি করে পুর্ববঙ্গের হিন্দুদের নাগরিকত্ব গ্রহন রোধ করে দেওয়া চয়। জাতীয় সংসদে তৈরী ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে শুধুমাত্র একটি নির্দেশিকার মাধ্যমেই বাতিল করে দেওয়া যায় কিনা? তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারতো। কিন্তু জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী কোন বাঙ্গালী এম,পি এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছে, এমন রেকর্ড পাওয়া যায়নি।

২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে সব থেকে বিপদ জনক ধারাটি হচ্ছে সেকশন ৩/এ, ৩/বি এবং ৩/সি। যে ধারার আওতায় পুর্ববঙ্গ থেকে আগত নাগরিকদের সন্তান সন্ততিদের জন্মসুত্রে পাওয়া নাগরিকত্বকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2003

Section-3

Citizenship by birth.

"3. Citizenship by birth.-(1) Except as provided in sub-section (2),every person bom in India-

(a) on or after the 26th day of January,1950, but before the 1st day of July, 1987;

(b) on or after the 1st day of July, 1987, but before the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003 and either of whose parents is a citizen of India at the time of his birth;

(c) on or after the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003, where-

(i) both of his parents are citizens of India; or

(ii) one of whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of his birth, shall be a citizen of India by birth.
(2) A person shall not be a citizen of India by virtue of this section if at the time of his birth-
(a) either his father or mother possesses such immunity from suits and legal process as is accorded to an envoy of a foreign sovereign power accredited to the President of India and he or she, as the case may be, is not a citizen of India;

জন্মসূত্রে পাওয়া নাগরিকদের পিতা অথবা মাতা যদি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারির পরে ভারতে ঢুকে থাকেন এবং সেকশন ২ ধারা মোতাবেক "illegal migrant" হয়ে যান তাহলে ভারতে জন্ম নেওয়া ঐ পরিবারের সন্তনটি ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে না।

মানবতা বিরোধী এই ধারাগুলো বাতিলের জন্য নিখিল ভারত বাঙ্গালী উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতিসহ অনেক গুলো সংগঠন সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন করছেন।

এই ভয়াবহ আইনের আওতায় শুধুমাত্র যে নমঃশূদ্ররাই পড়েছে তা কিন্তু নয়। পূর্ববঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহীসহ অন্যান্য জেলা থেকে যে সমস্ত রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা এসেছে তারাও কিন্তু এই আইনে বাদ পড়েননি। বাদ পড়েননি বর্ণহিন্দুরাও। আবার যে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছেন তারাও কিন্তু এই আইনে বেনাগরিক হতে বাধ্য। কিন্তু আশ্চর্য জনকভাবে কেবলমাত্র নমঃশূদ্রদেরই সরকারি ভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। কাষ্ট সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করলেই সরকারি অফিসারেরা পূর্ববঙ্গের লোক হিসাবে ট্রিটমেন্ট করতে থাকেন। চাওয়া হচ্ছে ১৯৭১ সালের আগের জমির দলিল। এইসব কিছু জেনেও রাজনৈতিক দলগুলো নীরব ভুমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এরকম আরো অনেক ঘটনার জন্য নমঃশূদ্ররা ঐক্যবদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্ররা যদি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে বর্জন করে, তারজন্য দায়ী থাকবে কিন্তু এদেশে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা।

অপরদিকে পাকিস্থানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে যে সমস্ত হিন্দুরা এদেশে আসছেন, তাদের ক্ষেত্রে আইনটা একেবারে ভিন্ন। তারা এদেশে সহজেই স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেতে পারেন। যতদুর জানা যাচ্ছে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তিটির আওতায় এখনো তারা রয়েছেন। কিছু যুক্তি দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই চুক্তি বাতিলের রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাকিস্থান ভেঙ্গে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তাই নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কি অদ্ভুত যুক্তি? বাবার নামের জমি ছেলে ব্যাবহার করতে পারবে না।

কিন্তু সব থেকে দুঃখের ব্যাপার স্বীকৃত বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো এই ধারার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। বরং উল্টো আসামসহ বিভিন্ন প্রদেশে এই আইনের বলে বহু লোকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভোটারলিষ্ট থেকে নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। কোথায়ও কোথায়ও ডি ভোটার করে দেওয়া হচ্ছে। ডি হলো ডাউট অথবা ডিসপুট ভোটার। পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ বিধান সভা নির্বাচনের পুর্বে মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে কলকাতা মেট্রোচ্যানেলে এই আইন বাতিলের জন্য একটি সমাবেশ করা হয়েছিল। যতটুকু জানা যায় ঐ সমাবেশে ডান বাম প্রতিটি দলের নেতারা মতুয়া মহাসংঘের বড় মা বিনা পানী দেবীর পাশে বসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ২০০৩ সালের আইনের বিরুদ্ধে তারা সকলেই সরব হবেন। ভোট বড় বালাই তাই বাঘে সিংহে এক ঘাটে জল খেতেও আপত্তি নেই। ভোট মিটে গিয়েছে, প্রতিশ্রুতিও মিটে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলই এই মানবতাবিরোধী আইনের বদল ঘটাতে চেষ্টা করেনি। কিন্তু এই একই

ঘটনা যদি শ্রীলঙ্কার তামিলদের সঙ্গে ঘটতো তাহলে ভারতের জাতীয় রাজনীতির চিত্রটাই বোধ হয় বদলে যেত। দক্ষিনের সমস্ত তামিলরা কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে রে রে করে তেড়ে আসতো। শ্রীলঙ্কার যে তামিলরা কোনদিনও ভারতের অংশই ছিল না, তাদের জন্য ভারতীয় তামিলদের জাতির টান দেখে বাংলার নেতাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। একসময়ের ভারতীয় নাগরিক পুর্ববঙ্গের বাঙ্গালীদের রক্ষার জন্য বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো শুধু ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েই শেষ। তাও ইতিহাসে একবার মাত্র, মতুয়াদের ভোটের লোভে।



আনন্দবাজার পত্রিকা

মতুয়া মঞ্চে পাশাপাশি তৃণমূল-সিপিএম

ভোটের মুখে মন পাওয়ার মরিয়া প্রয়াস

২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবীতে মতুয়া সমাবেশে ডান-বাম সকল দল একমঞ্চে

যদি ধরে নেওয়া হয় ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে এই আইনটি জরুরী ছিলো তথাপিও মানবতার খাতিরে পুর্ববঙ্গের হিন্দু যারা কোন এক সময় ভারতেরই নাগরিক ছিলেন তাদের রক্ষার জন্য একটি বিশেষ ধারা রাখাই যেত। যেমন ভাবে বিদেশে অবস্থানকারী ভারতীয়দের দ্বৈত নাগরিকের বিধান রাখা হয়েছে।

একদিকে বাঙ্গালী শক্তিকে দুর্বল করছে হিন্দিবাদীদের রাজনৈতিক কৌশল, অন্যদিকে গান্ধীবাদী অহিংসা মতবাদ রক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে বাংলার প্রশাসকেরা। বাংলার জন্য যারা আন্দোলন করছেন তাদেরকে গ্রেফতার করে বাংলার প্রশাসকেরা নিরপেক্ষতা প্রমান করতে চাইছেন। উত্তরবঙ্গে যারা বাংলাভাগের বিরোধীতা করে রাস্তায় নামে, সেই বাংলা ও বাংলাভাষা বাচাও কমিটির সভাপতি ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারকে গ্রেফতার ও সম্পাদক চিন্ময় চক্রবর্তীকে প্রশাসকেরা হয়রানি করছে। পাশাপাশি যারা কোনদিনও ভারতের নাগরিক ছিলেন না এবং বাংলাকে ভাগ করতে চায়, সেই নেপালীদের প্যাকেজের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে রাজকীয় সম্মান। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে বেকার ছেলে মেয়েদের অভাব নেই, সেখানে পুলিশের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হয় নেপালী ভাষাতে।

১৯৪৭ সাল থেকে আজ অবধি বাঙ্গালী শক্তিকে দুর্বল করার জন্য যতগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সবগুলোতেই হিন্দি শাষকেরা সফল হয়েছেন। বাংলাকে ভাগ করে পুর্ববাংলার বাঙ্গালী হিন্দুদের পুড়িয়ে মারার ফাঁদ পাতা হয়েছে। সারা জীবন জ্বলবে বাঙ্গালীচিতার আগুন। তৈরী হয়েছে জ্বলন্ত চিতা, তাই প্রশ্ন থাকলো বাঙ্গালী ও নমঃশূদ্রদের জ্বলন্ত চিতা চিরদিনই কি জ্বলতে থাকবে?

বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক ভূল

১। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসকে যখন বৃটিশদের নিকটে বন্ধক রেখে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরিকল্পনা করা হয় তখন অবিভক্ত ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ (ত্রিপুরা, আসাম ও অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা) বাঙ্গালী একজোট হয়ে কোন প্রতিবাদ করেনি। এটা ছিল একটি ঐতিহাসিক ভুল।

২। ভারতের সীমানা নির্ধারনের সময় বাংলাকে যখন খন্ড করা হয় তখন বাংলার নেতারা কোন প্রতিবাদ করেনি বা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করেননি। ফলতো বাঙ্গালী ভোটার দ্বিখন্ডিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ভুলের মধ্যে এটিও একটি।

৩। পুর্ববঙ্গের হিন্দুদের যখন বাংলার বাইরে পুনর্বাসন দেওয়া হয় তখন বাংলার শাষকেরা কোন প্রতিবাদ করেননি। ফলতো একটা বাঙ্গালী জনজাতি হিন্দি জনজাতিতে রুপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, কমছে বাঙ্গলীর সংখ্যা। এটাও ঐতিহাসিক ভূল।

৪। বাঙ্গালীর ভোটে নির্বাচিত এম,এল,এ, দের ভোটে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে অবাঙ্গালী লোকদের নির্বাচিত করাটা বাঙ্গালীর চিরকালের ঐতিহাসিক ভুল।

৫। প্রধানমন্ত্রীত্ব হাতে পেয়েও জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসতে না দেওয়ার প্রতিবাদে, হিন্দি কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বাঙ্গলীদের বিদ্রোহ না করাটা ছিল আধুনিক ঐতিহাসিক ভুল।

৬। বাংলাকে অশান্ত রাখতে গোর্খা, কামতাপুর ও গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবীদারদের প্রতি কেন্দ্রিয় উৎসাহদানের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ না করাটা বাঙ্গালীর বর্তমান ভুল।

৭। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশের সময় সংসদে বাঙ্গালী এম,পি, দের প্রতিবাদ না করাটা ছিল বাঙ্গালীর আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের মতো চরম ভুল।

নমঃশূদ্রদের ঐতিহাসিক ভূল

১। গণপরিষদের নির্বাচনে বাবা সাহেব ভীম রাও আম্বেদকরকে সমর্থন করাটা নমঃশূদ্রদের ঐতিহাসিক ভুল ছিল। এখানে বাবা সাহেবকে শূদ্রের প্রতিনিধি না করে, যদি বাংলা থেকে কোন নমঃশূদ্রকে গণপরিষদে পাঠানো হতো, তাহলে অন্তত পক্ষে বাংলাভাগের সময় তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। তাছাড়া যে নমঃশূদ্রদের জন্য বাবা সাহেব গণপরিষদে যেতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র সেই নমঃশূদ্রদের জন্য তার কোন অবদান তেমনভাবে দেখা যাচ্ছেনা। তিনি হয়তো সিডুল কাষ্টের জন্য অনেক কিছু রেখে গিয়েছেন, কিন্তু যারা চরম বিপদের দিনে বাবা সাহেবের পাশে দাড়িয়ে ছিলেন, স্পেশালী সেই নমঃশূদ্র নামটা তিনি কোথায়ও ব্যাবহার করেননি। এখানে উল্লেখ্য বাবা সাহেবের শিক্ষা, পান্ডিত্য ও নেতৃত্ব শূদ্রের ভগবান হিসাবে সর্বদা স্বীকৃত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দিবাদী শূদ্রসমাজ নির্বাচনে তাকে প্রত্যাখান করেছিলো, কিন্তু বাংলার নমঃশূদ্ররা গণপরিষদে পাঠিয়ে তাকে ভগবান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাভাগ করে নমঃশূদ্রদের জন্য জলন্ত চিতা তৈরীটা, বাবা সাহেব কেন রোধ করতে পারলেন না? এই প্রশ্নটা রয়েই গেল।

২। কথিত রয়েছে যোগেন মন্ডলের ধারনা ছিল উচ্চবর্ণের লোকদের থেকে মুসলমানরা ভাল, মুসলমানদের সঙ্গে থাকলে পুর্ববঙ্গের নমঃশূদ্ররা স্বাচ্ছন্দে থাকবে, তাই তিনি দেশ ভাগের সময় পাকিস্থানের সঙ্গে থাকার জন্য মত দিয়েছিলেন। এই তথ্য যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ঐ সিদ্ধান্ত ছিল একটি ঐতিহাসিক ভূল। যা তিনি নিজেই পাকিস্থান ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়ে প্রমান করে গিয়েছেন। তবে এই সিদ্ধান্তের অন্তরালে হিন্দি শাষকদের কোন কুটনৈতিক কৌশল অথবা পুর্ববঙ্গের হিন্দু অধুষিত জেলাগুলো নিয়ে যোগেন মন্ডলকে কোন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কিনা সেটা জানা যায়নি।

৩। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে প্রবেশ করে আবার বাংলাদেশে ফিরে যাওয়াটা ছিল নমঃশূদ্র সমাজের লোকদের ঐতিহাসিক ভূল।

পরিশেষে

পুর্ববঙ্গের হিন্দুদের যদি এভাবে ব্রাত্য করে রাখা না হতো তাহলে হয়তোবা জ্যোতি বসুর মতো আরও রাজনীতিবিদ, শঙ্কর রায় চৌধুরীর মতো আরও সেনা নায়ক পাওয়া যেত, যারা ভারতের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে পারতেন। হয়তো ভারত পেতে পারতো রাষ্ট্রপতিপুত্র সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জীর মা, মিসেস প্রনব মুখার্জীর মতো ভাগ্যবতী আরও অনেক নারীকে। বহু প্রতিভাবান বাঙ্গালী সন্তান বাংলা থেকে সোজা বিদেশের মাটিতে চলে গিয়েছে। ঘুরে ফিরে প্রতিভাবান বাঙ্গালীরা সেই ইংরেজদেরকেই চিকিৎসা, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের নাগরিকেরা যদি ভারতের সেবা না করে, ইংরেজদেরই সেবা করে, তাহলে স্বাধীন ভারতের কি প্রয়োজন ছিল? ইংরেজদেরই বা তাড়ানোর কি দরকার ছিলো? স্বাধীন ভারতের স্বাদটুকু থেকে বাঙ্গালীরা কেন ব্রাত্য থাকবেন? হিন্দি সম্রাজ্যবাদীদের নিকটে সকল বর্ণের বাঙ্গালীরা সমান মর্যাদাহীন। দিল্লির দরবারে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুস্থানীদের থেকেও উচ্চবর্ণীয় বাঙ্গালীদের মুল্য অনেক কম। আজ নিম্নবর্ণীয় হিন্দুস্থানীরা দিল্লীর মসনদের চারপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ফাক পেলেই কুর্শি দখল করে নেয় । যে কোন মুহুর্তে প্রধানমন্ত্রীর মতো শীর্ষ পদটিতেও অধিষ্ঠিত হতে পারেন শূদ্র সমাজের প্রতিনিধি। আর এই সংবাদে নিম্নবর্ণীয় বাঙ্গালী হিন্দুদের আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই বরং দূঃসংবাদ রয়েছে খানিকটা। বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী শূদ্র সমাজের বহিনজী মায়াবতী, মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালীন ২০০৭ সালে কেন্দ্রিয় সরকারকে পত্র মারফৎ জানিয়ে দিয়েছেন, উত্তর প্রদেশে নমঃশূদ্ররা সিডুলকাষ্টের কোন সুযোগ সুবিধার আওতায় পড়বে না। যে সমস্ত নমঃশূদ্ররা বামসেফ নামক দলিত সংগঠন করছেন তাদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে, নমঃশূদ্রদের সিডুল কাষ্টের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য নিম্ন ও উচ্চ আদালতে অনেকগুলো মামলা চলছে। যে কোন মুহুর্তে সিডুল কাষ্টের তালিকা থেকে নমঃশূদ্ররা বাদ যেতে পারেন। ২০১৩ সালের মাঝামাঝি সময় শিলিগুড়ি সফরকালে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে বামসেফের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ ওয়ামন মেশ্রাম এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে ছিলেন ''নমঃশূদ্রদের জন্য আলাদা কিছু ভাবা হচ্ছে না"। সুতরাং অস্থিত্বের সঙ্কটে রয়েছে সিডুল কাষ্টের আওতাধীন বাঙ্গালী নমঃশূদ্র সমাজ। অতএব নিজেদের জাতিকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে নিজেদেরকেই। সেটা হোক নমঃশূদ্র আর অবশ্যই বাঙ্গালীয়ানায়।

অপরদিকে স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীকে মাথা উচু করে দাড়াতে হলে রক্ষা করতে হবে প্রতিটি বাঙ্গালীকে। ঐক্যবদ্ধের শক্তি দিয়ে ছিনিয়ে নিতে হবে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষ পদগুলি। বাতিল করতে হবে ২০০৩ সালের কালাকানুন। বাঙ্গালী প্রশাসক দিয়ে গঠন করতে হবে উন্নত ভারত। বাঙ্গালীর শক্তিতে হতে হবে বলিয়ান। তবেই বাংলা পাবে স্বাধীন ভারতের স্বাদ।

শিঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

১। কামতাপুর রাজ্যের ভয়াবহতা ঃ লেখক - মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্য

(কোন একটা সংগঠন পৃথক রাজ্য কামতাপুর দাবী করতেই পারে। কিন্তু যে রাজ্যের দাবীদারদের প্রথম শ্লোগান ‘‘ বাঙ্গালী (ভাটিয়া) খেদাও, কামতাপুর বাচাও,,। তাদের নেতৃত্বে গঠিত রাজ্যে সাধারন মানুষের নিরাপত্তা কতটুকু থাকতে পারে? পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় এমন কোন রাজ্য বা দেশের ঠিকানা পাওয়া যায়নি, যে দেশটিতে কেবল একটি সম্প্রদায়ের জনজাতির বসবাস। একটি আঞ্চলিক ভাষা যার হরফগুলো বাংলা এবং শুনতেও প্রায় বাংলারই মতো, সেই ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে তৈরী হওয়া আন্দোলন, হঠাৎ কিভাবে পৃথক রাজ্যের আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো তা বোধগম্য হচ্ছেনা।-------)

২। হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয় ঃ লেখক - মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্য

(সমগ্র ভারতবাসীর ঘাড়ের উপর জোর করে হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবনতা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। সম্পুর্ন অজানা ও অস্বীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যার বিরুদ্ধে গুজরাতের হাইকোর্টে ২৫/০১/২০১০ তারিখেএকটি জনস্বার্থ মামলা হয় এবং মাননীয় হাইকোর্টএকটি ঐতিহাসিক রায় দিয়ে জানিয়ে দেয় হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়---)

৩। আঞ্চলিকতাবাদ ও ভারতীয় রাজনীতি ঃ লেখক- অনুপ কুমার মন্ডল

(পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্তিক রাষ্ট্র ভারত। নানা ভাষা ও নানান সংস্কৃতিতে ভরপুর এই ভারতবর্ষ। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের চাহিদাটাও নানান ধরনের। যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশাসন চালানো কার্যত অসম্ভব। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে দীর্ঘদিন যাবত ভারতে জাতীয় রাজনীতিতে এক দলীয় শাসন কায়েম ছিল। দিন যত এগিয়েছে মানুষেরা নিজের নিজের চাহিদাকে অধিকার হিসাবে গ্রহন করেছে। আর এই কারনেই জাতীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। জন্ম নিয়েছে অঞ্চলভিত্তিক নতুন নতুন রাজনৈতিক দল। আর গণতন্ত্রের শেষ কথা বলে ভোটার। ভোটারদের আঞ্চলিক চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়ায় ভোটের আঞ্চলিক মেরুকরন হতে বাধ্য। তাই আঞ্চলিক দলগুলোর গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ফলে সমগ্র ভারতের মানুষেরা তাদের নিজ নিজ চাহিদামতো সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন---------)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শূদ্র সমাচার পাবলিকেশন্স

বি-৭৮ স্যাটেলাইট টাউন, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১৫